পূর্বাচলে চাঁদার নিয়ন্ত্রণ এমপি দিপু-মনিরের অনুসারীদের হাতে



ছবি: লেন্স এশিয়া

নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য ও নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা কাজী মনিরুজ্জামান মনিরের অনুসারীদের বিরুদ্ধে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ দোকানপাট থেকে চাঁদা আদায়ের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সরকারি একটি সংস্থার বিশেষ প্রতিবেদন ও মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধানের তথ্যের বরাত দিয়ে সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়েরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে এই তথ্য তুলে ধরেন।

রোববার (১ নভেম্বর) রাতে ফেসবুকে দেওয়া ওই পোস্টে লিখেন, পূর্বাচলের আটটি বড় বাণিজ্যিক এলাকার প্রায় ৭০০ দোকান থেকে প্রতিদিন অন্তত ৫ লাখ ৪০ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে। মাসে এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৬২ লাখ টাকা। চাঁদা আদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামের পাশাপাশি তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয়ও পোস্টে তুলে ধরেন।

পোস্টে তিনি আরও লিখেন, অর্থ আদায়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বড় একটি অংশ সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপুর অনুসারী হিসেবে পরিচিত। অন্য একটি অংশ বিএনপির নেতা কাজী মনিরুজ্জামান মনিরের অনুসারী। এ ছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের সময়কার একটি চক্রের কয়েকজনের সংশ্লিষ্টতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

সরাসরি চাঁদা না বলে বিদ্যুৎ ও পানির বিলের নামে দোকানিদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়। দোকানে কতটি বাতি, ফ্যান, ফ্রিজ ও পানির কল রয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হারে অর্থ আদায় করা হয়। প্রতি বাতির জন্য ১৫০ টাকা, ফ্যানের জন্য ২৫০ টাকা, ফ্রিজের জন্য ৩০০ টাকা এবং পানির কলের জন্য ১০০ টাকা দিতে হয়। এসব অর্থ আদায়ের বিপরীতে কোনো রসিদ দেওয়া হয় না। হিসাব সংরক্ষণের জন্যও নেই কোনো খাতা।

১৯৯৫ সালে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। পরিকল্পনা ছিল, ঢাকার বিকল্প হিসেবে সেখানে গড়ে উঠবে আধুনিক একটি শহর। তিন দশক পেরিয়ে গেলেও প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। এ পর্যন্ত আটবার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে এবং একাধিকবার পরিবর্তন করা হয়েছে নকশা।

রূপগঞ্জ ও গাজীপুরের কালীগঞ্জের মধ্যে শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর মাঝামাঝি ৬ হাজার ২০০ একর জমিতে ৩০টি সেক্টর নিয়ে শহরটি গড়ে ওঠার কথা। কাগজে-কলমে প্রকল্পের ৭০ শতাংশ কাজ এবং জমি উন্নয়নের ৯৬ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। তবে অনেক প্লটমালিক এখনো তাঁদের জমিতে বাড়ি নির্মাণ করতে পারেননি।

কুড়িল থেকে ৩০০ ফুট প্রশস্ত লিংক রোড চালু হওয়ার পর পূর্বাচল ঢাকাবাসীর অন্যতম বিনোদনকেন্দ্রে পরিণত হয়। সন্ধ্যা নামলেই সড়ক, লেকপাড় ও বিভিন্ন চত্বরে মানুষের ভিড় বাড়ে। এই সুযোগে রাজউকের অনুমোদন ছাড়াই পেট্রোল পাম্পের জন্য নির্ধারিত জমি, খেলার মাঠ, ঈদগাহ, ওয়াকওয়ে, পার্ক ও লেকের পাড়ে গড়ে উঠেছে দোকানপাট। সরকারি প্রতিবেদনের হিসাবে, প্রকল্প এলাকায় স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকানের সংখ্যা এক হাজারের বেশি।

সবচেয়ে বেশি দোকান রয়েছে ১ নম্বর সেক্টরের নীলা মার্কেটে। সেখানে খাবার ও প্রসাধনীর দোকান প্রায় ২২০টি। ১১ নম্বর সেক্টরের লেকপাড়ে রয়েছে ১২০টি এবং ১৭ নম্বর সেক্টরের শহীদ ময়েজউদ্দিন চত্বরে ১২০টির বেশি দোকান। একই সেক্টরের ফারুক মার্কেটে দোকানের সংখ্যা শতাধিক।

এ ছাড়া গুরুলিয়া চত্বরে ৫০টি, ল্যাংটার মাজারে ৪০টি, জয় বাংলা চত্বর ও একুশে চত্বরে ৩০টি করে এবং ঈদগাহ চত্বর, সুমু মার্কেট ও জলসিঁড়ি চত্বরে ২০টি করে দোকান রয়েছে। এসব এলাকার বাইরে বিভিন্ন সেক্টরের ভেতরের সড়কগুলোতে ছড়িয়ে আছে আরও প্রায় ৪০০ ছোট-বড় দোকান।

ফেসবুক পোস্টে দাবি করা হয়েছে, এসব দোকানের কোনোটিরই ট্রেড লাইসেন্স, খাদ্য লাইসেন্স কিংবা পরিবেশগত ছাড়পত্র নেই। বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগও নেওয়া হয়েছে অবৈধভাবে। অর্থাৎ রাজউকের জমিতে অনুমোদনহীন সংযোগ ব্যবহার করে বড় ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম চললেও সরকার এ থেকে কোনো রাজস্ব পাচ্ছে না।

সরকারি সংস্থার প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে পোস্টে দোকানগুলোর দৈনিক বিক্রির একটি হিসাবও দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, পূর্বাচলের একটি টং দোকানে প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা বিক্রি হয়। মাঝারি দোকানে বিক্রির পরিমাণ ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। বড় রেস্তোরাঁয় দৈনিক বিক্রি হয় এক থেকে দেড় লাখ টাকা। ছুটির দিনে এই বিক্রি তিন থেকে পাঁচ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়।

সব মিলিয়ে পূর্বাচলের অবৈধ দোকানপাট ও রেস্তোরাঁগুলোতে প্রতিদিন প্রায় আড়াই থেকে তিন কোটি টাকার লেনদেন হয়। মাসে এর পরিমাণ ১১৫ থেকে ১২০ কোটি টাকা এবং বছরে ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বলে পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বিপুল বাণিজ্য থেকে সরকার কতটা রাজস্ব পাচ্ছে, সে প্রশ্নও তুলেছেন সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের। তাঁর পোস্টে বলা হয়েছে, সাধারণ রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ। এই হারে হিসাব করলে মাসে সরকারের কোষাগারে প্রায় ৫ কোটি ৮৫ লাখ টাকা এবং বছরে ৭০ কোটির বেশি টাকা জমা হওয়ার কথা। এর বাইরে ট্রেড লাইসেন্স ফি, আয়কর এবং রাজউকের জমি ইজারা দেওয়ার মাধ্যমে সম্ভাব্য রাজস্বের বিষয়টিও রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ দোকানের বৈধ অনুমোদন না থাকায় বিপুল অর্থের বাণিজ্য

হলেও সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে পোস্টে দাবি করা হয়েছে।

দোকানিদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের নির্ধারিত হারও পোস্টে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। প্রতি বাতির জন্য ১৫০ টাকা, ফ্যানের জন্য ২৫০ টাকা, ফ্রিজের জন্য ৩০০ টাকা এবং পানির কলের জন্য ১০০ টাকা নেওয়া হয়। রাত ১১টার পর দোকান খোলা রাখলে বাড়তি অর্থ দিতে হয়। এ সময় প্রতি বাতির জন্য আরও ৫০ টাকা, ফ্যানের জন্য ১০০ টাকা এবং ফ্রিজের জন্য ২০০ টাকা আদায় করা হয়।

উৎসব, ছুটির দিন কিংবা বড় কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে দোকানপ্রতি অতিরিক্ত ১ হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। নতুন দোকান বসানো কিংবা দোকানের মালিকানা হাতবদলের সময় 'বিট' হিসেবে এককালীন ৫০ হাজার থেকে আড়াই লাখ টাকা দিতে হয়।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর কয়েক সপ্তাহ এসব অর্থ আদায় বন্ধ ছিল। পরে আবার আগের মতোই আদায় শুরু হয় বলে পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে যাচাইয়ের বরাত দিয়ে আটটি বড় চত্বরের প্রায় ৭০০ দোকান থেকে প্রতিদিন ৫ লাখ ৪০ হাজার টাকা আদায়ের হিসাব দেওয়া হয়েছে।

হিসাব অনুযায়ী, ১ নম্বর সেক্টরের নীলা মার্কেটের ২২০টি দোকান থেকে প্রতিদিন ২ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং মাসে ৬৬ লাখ টাকা আদায় করা হয়। ১১ নম্বর সেক্টরের লেকপাড়ের ১২০টি দোকান থেকে প্রতিদিন ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ও মাসে ৩৬ লাখ টাকা নেওয়া হয়। ১৭ নম্বর সেক্টরের শহীদ ময়েজউদ্দিন চত্বরের ১২০টি দোকান থেকেও প্রতিদিন ১ লাখ ২০ হাজার এবং মাসে ৩৬ লাখ টাকা আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

একই সেক্টরের ফারুক মার্কেটের ১০০টি দোকান থেকে প্রতিদিন ১ লাখ টাকা এবং মাসে ৩০ লাখ টাকা আদায় করা হয়। ১৩ নম্বর সেক্টরের গুরুলিয়া চত্বরের ৫০টি দোকান থেকে প্রতিদিন ৫০ হাজার ও মাসে ১৫ লাখ টাকা নেওয়া হয়। ১১ নম্বর সেক্টরের ল্যাংটার মাজারের ৪০টি দোকান থেকে প্রতিদিন ৪০ হাজার এবং মাসে ১২ লাখ টাকা আদায়ের তথ্য রয়েছে।

এ ছাড়া ২১ নম্বর সেক্টরের একুশে চত্বরের ৩০টি দোকান থেকে প্রতিদিন ৩০ হাজার ও মাসে ৯ লাখ টাকা এবং জলসিঁড়ি চত্বরের ২০টি দোকান থেকে প্রতিদিন ২০ হাজার ও মাসে ৬ লাখ টাকা আদায়ের কথা পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই হিসাবের বাইরে রয়েছে সেক্টরের ভেতরের সড়কগুলোতে থাকা প্রায় ৪০০ দোকান। বিশেষ দিবসে অতিরিক্ত আদায় এবং নতুন দোকান বসানো কিংবা দোকানের মালিকানা পরিবর্তনের সময় নেওয়া এককালীন অর্থও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে বলে পোস্টে দাবি করা হয়েছে।

তবে সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সব দোকান এই চাঁদা আদায়ের সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে নয়। কিছু দোকানি প্লটমালিকের অনুমতি নিয়ে অথবা নামমাত্র ভাড়ায় দোকান পরিচালনা করছেন। তাঁদের ব্যবসাও অবৈধ হলেও নিয়মিত কাউকে চাঁদা দিতে হয় না।

চাঁদা আদায়ের সঙ্গে যাঁদের নাম এসেছে

সরকারি সংস্থার বিশেষ প্রতিবেদনে পূর্বাচলের বিভিন্ন চত্বর থেকে অর্থ আদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ও রাজনৈতিক পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়েরের পোস্টেও তাঁদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

১ নম্বর সেক্টরের নীলা মার্কেটের মূল সমন্বয়ক হিসেবে মো. সুজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যুবদল নেতা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আল-আমিন, যিনি জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুবদল নেতা; মো. রাসেল ও নজরুল ইসলাম, দুজনই যুবদল নেতা; এবং স্থানীয় যুবদল নেতা দ্বীন ইসলাম। পোস্টে বলা হয়েছে, এই পাঁচজনই সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপুর অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

নীলা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে বলে পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে সুজনের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছেন জেলা ছাত্রদলের সাবেক আরেক সহসভাপতি আবু মাসুম। তিনি কাজী মনিরুজ্জামান মনিরের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ নীলা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিএনপির দুই নেতার অনুসারীদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

১৩ নম্বর সেক্টরের গুরুলিয়া চত্বরে সংশ্লিষ্ট হিসেবে বাকী প্রধান ও শাহীন প্রধানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। দুজনই স্থানীয় বিএনপি নেতা এবং সংসদ সদস্য দিপুর অনুসারী।

জলসিঁড়ি চত্বরে নিয়ন্ত্রণ দুই পক্ষের মধ্যে ভাগাভাগি রয়েছে বলে পোস্টে দাবি করা হয়েছে। এক পক্ষের মৃদুল হাসান স্থানীয় বিএনপি নেতা ও দিপুর অনুসারী। অন্য পক্ষের মো. জর্জ মিয়া কাজী মনিরের অনুসারী।

১১ নম্বর সেক্টরের ল্যাংটার মাজারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক দুলাল হোসেন। তিনি নিজেও নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন শাহ আলম, যাঁর পরিচয় স্থানীয় সাংবাদিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

একই সেক্টরের লেকপাড়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিসেবে ছয়জনের নাম এসেছে। তাঁরা হলেন শাহিনুর রহমান, হাবিবুর রহমান, মহিবুর রহমান, মোমেন হোসেন, সালাউদ্দিন খান ও মামুন মিয়া। তাঁদের কারও দলীয় পদ নেই। সবাইকে স্থানীয় বিএনপি সমর্থক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৭ নম্বর সেক্টরের ফারুক মার্কেট গাজীপুরের কালীগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত। এ কারণে এর নিয়ন্ত্রণে অন্য এলাকার ব্যক্তিরা রয়েছেন বলে পোস্টে দাবি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মো. আমান উল্লাহ, নাগরী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি; মো. আমান, একই ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক; এবং স্থানীয় বিএনপি নেতা রহিম সরকার।

২১ নম্বর সেক্টরের একুশে চত্বরে সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের অনুসারীদের একটি অংশ এখনো অর্থ আদায়ের সঙ্গে যুক্ত বলে পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা ও চেয়ারম্যান মো. সালাউদ্দিনের কয়েকজন সমর্থক এখান থেকে টাকা আদায় করছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ১৭ নম্বর সেক্টরের শহীদ ময়েজউদ্দিন চত্বরের অর্থ আদায়ের সঙ্গে সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপুর অনুসারীদের সংশ্লিষ্টতার কথা সরকারি প্রতিবেদনের মন্তব্য অংশে উল্লেখ রয়েছে বলে পোস্টে জানানো হয়েছে।

পোস্টে আরও বলা হয়েছে, পূর্বাচলের দোকানপাট থেকে অর্থ আদায়ের এই ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ সরকারের সময় থেকেই চলে আসছে। তখনকার বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীর ছত্রচ্ছায়ায় এই বাজারের নিয়ন্ত্রণ ছিল। মাঠপর্যায়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও চেয়ারম্যান মো. সালাউদ্দিন এবং তাঁর কর্মীরা সক্রিয় ছিলেন বলে সরকারি প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে পোস্টে বলা হয়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর কয়েক সপ্তাহ দোকানিরা কাউকে টাকা দেননি। পরে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপুর অনুসারী এবং বিএনপির আরেক কেন্দ্রীয় নেতা ও বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি কাজী মনিরুজ্জামান মনিরের অনুসারীরা চাঁদা আদায়ের নিয়ন্ত্রণ নেন।

দিপু পক্ষের সমন্বয়ক হিসেবে সুজন এবং মনির পক্ষের সমন্বয়ক হিসেবে আবু মাসুমের নাম এসেছে। দুজনই জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি। একই সংগঠনের সাবেক দুই সহকর্মী এখন দুই পক্ষের হয়ে অর্থ আদায়ের সমন্বয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

তখন দিপু বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। বর্তমানে তিনি নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য। রূপগঞ্জ তাঁর নির্বাচনী এলাকা এবং পূর্বাচলও এই আসনের অন্তর্ভুক্ত।

নিরাপত্তা ও পরিবেশ নিয়েও উদ্বেগ

সরকারি প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণের বরাত দিয়ে পোস্টে পূর্বাচলের রাতের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রাতের ভিড়ের সুযোগে ছিনতাইকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দর্শনার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে মাদকের প্রবণতাও বাড়ছে।

রাত গভীর হলে একদল তরুণ ৩০০ ফুট সড়কে গাড়ি ও মোটরসাইকেল নিয়ে রেসে অংশ নেয়। এতে এক্সপ্রেসওয়েতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে বলে পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

খাবারের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও দুর্বল বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। অধিকাংশ দোকান ও রেস্তোরাঁয় খাদ্য লাইসেন্স এবং নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা না থাকায় পরিবেশিত খাবারের মান যাচাই করা যাচ্ছে না। সরেজমিনে পুরোনো তেল ও বাসি খাবার পরিবেশনের অভিযোগ পাওয়ার কথাও পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া রেস্তোরাঁগুলোর তরল বর্জ্য পাশের খাল ও লেকে ফেলা হচ্ছে। যে লেকের পাড়ে বসে দর্শনার্থীরা খাবার খাচ্ছেন, সেই লেকেই গিয়ে পড়ছে রেস্তোরাঁর বর্জ্য। সড়কের পাশেও জমছে ময়লার স্তূপ। এতে পূর্বাচলের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

পোস্টের শেষাংশে সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্যও যুক্ত করেছেন। সেখানে তিনি স্পষ্ট করেছেন, স্থানীয় সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু কিংবা তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কাজী মনিরুজ্জামান মনিরের নির্দেশে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে, এমন দাবি তিনি করেননি। বরং সরকারি প্রতিবেদনে যাঁদের নাম এসেছে, তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয়

ও অর্থ আদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার তথ্য তুলে ধরেছেন।

LENS ASIA